HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

টপিক – ০১ সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম
টপিক ০২: বাংলাদেশে সামাজিক নীতি
টপিক ০৩: বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪
টপিক ০৪: জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
টপিক ০৫: জাতীয় শিশু নীতি ২০১১
টপিক ০৬: সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

নীতি, সামাজিক নীতি এবং সমাজকল্যাণ নীতি (Policy, Social Policy and Social Welfare Policy) একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় এগুলো একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। নীতি, সামাজিক নীতি এবং সমাজকল্যাণ নীতির সংজ্ঞা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো, যাতে এগুলোর পারস্পরিক পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

নীতির ধারণা

নীতি একটি ব্যাপক পরিভাষা। সরকার গৃহীত যাবতীয় কার্যাবলি নির্দেশ করতে নীতি প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ অর্থে, নীতি হলো কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে উপনীত হবার কতগুলো পূর্ব সিদ্ধান্ত, যেগুলো লক্ষ্যে পৌছার নির্দেশনা (Guide line) হিসেবে গৃহীত হয়। কোন লক্ষ্যে উপনীত হবার সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম গ্রহণ করার সাধারণ নির্দেশনা হলো নীতি, যা লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে কি করা যায় এবং কি করা যায় না, তার বর্ণনা দেয়।

সমাজকর্ম অভিধানের (Social Work Dictionary) সংজ্ঞানুযায়ী, নীতি হলো প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত স্থায়ী পরিকল্পনা, যা কোন সংগঠন বা সরকার কর্ম সম্পাদনের নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করে। (Policy is the explicit or implicit standing plan that an organization or government uses as a guide for action.)' কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার কার্যক্রম পরিচালনার বিধিমালা নির্দেশ করতে নীতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের বিধি-বিধানকে নীতি (Policy) প্রত্যয়টি নির্দেশ করে।

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

সামাজিক নীতির ধারণা

নীতির সঙ্গে সামাজিক (Social) প্রত্যয়টি যুক্ত হলে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। সমাজ এবং সামাজিক মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক নীতি সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সামাজিক নীতি (Social policy) প্রত্যয়টি সমাজ ও সামাজিক মানুষের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতে হয়।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, সামাজিক নীতি হলো কোন সমাজের সেসব কার্যক্রম এবং বিধি-বিধান, যেগুলো ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব কার্যক্রম ও বিধিগুলো সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রথার ফল। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হতে সামাজিক নীতি সম্পদের কটন এবং জনকল্যাণের অবস্থান নির্ধারণ করে।

সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী সামাজিক নীতির পরিধিভুক্ত হলো সরকার, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও জনগণ গৃহীত শিক্ষাসেবা, স্বাস্থ্যসেবা, অপরাধ ও অপরাধ সংশোধন, আর্থিক নিরাপত্তা এবং সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক হলো সামাজিক নীতি।

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

সামাজিক নীতির ধারণা

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রকাশিত Encyclopaedia of Social Work (1995) গ্রন্থের সংজ্ঞানুযায়ী, সামাজিক নীতি হলো আইন, প্রশাসনিক নির্দেশনা এবং এজেন্সীর বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেসব মূলনীতি, কর্মপ্রণালী ও কর্মসম্পাদনের উপায়, যেগুলো মানুষের কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

(Social policies are those principles, procedures and courses of action established in statute, administrative code and agency regulation that affect people's social well being.)। এদিক থেকে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন এবং ব্যক্তিগত কল্যাণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন সব নিয়মকানুন ও বিধিবিধানকে সামাজিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

সামাজিক নীতির ধারণা

সামাজিক নীতির সাধারণ অথচ বাস্তবসম্মত সংজ্ঞায় ইংরেজ সামাজিক নীতিবিদ রিচার্ড টিটমাস (Richard Titmuss) বলেছেন, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার সমষ্টিগত বা যৌথ কৌশল হলো সামাজিক নীতি। (Social policy is a collective strategy to address social problem.)' সামাজিক নীতির আলোচ্য সংজ্ঞানুযায়ী, যখন কোন নির্দিষ্ট নীতি সামাজিক সমস্যাকে প্রভাবিত করে, তখন সেটি সামাজিক নীতিতে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন কোন কর নীতির প্রস্তাব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি অর্থাৎ দরিদ্র বা বেকারত্বকে প্রভাবিত করে, তখন তা সামাজিক নীতিতে পরিণত হয়। আবার, যেসব করনীতি কোন কর্পোরেশনের যন্ত্রপাতি হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রণীত হয়, সেসব কর নীতি সামাজিক নীতি হতে পারে না।

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

সামাজিক নীতির ধারণা

অধ্যাপক মার্শাল (Professor Marshall) বাস্তবতার নিরিখে সামাজিক নীতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, সামাজিক নীতি প্রত্যয়টি সরকার গৃহীত সেসব নীতিমালার নির্দেশক, যেগুলো নাগরিকদের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কল্যাণ নিশ্চিত করার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। সামাজিক নীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো সামাজিক বীমা, সরকারি বা জাতীয় সাহায্য, স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক সেবা এবং গৃহসংস্থান নীতি।'

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, সামাজিক নীতি হলো সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা বা নির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্যে উপনীত হবার কতগুলো পূর্ব সিদ্ধান্ত বা কর্মসম্পাদনের উপায়, যেগুলো কর্মসম্পাদনের নির্দেশনা হিসেবে অনুসরণ করা হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার সামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচির পূর্বনির্দেশনা হলো সামাজিক নীতি।

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

সমাজকল্যাণ নীতি

সামাজিক নীতি এবং সমাজকল্যাণ নীতি অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সমাজকল্যাণ নীতি হলো বৃহত্তর সামাজিক নীতির একটি অংশ। সমাজকল্যাণ নীতি হলো সামাজিক নীতি উপ-সেট (A sub-set of social policy)। সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হলো সমাজকল্যাণ নীতি। সামাজিক নীতি হলো ব্যাপক পরিধি সম্পন্ন জননীতি, আর জননীতির বিশেষ দিক হলো সমাজকল্যাণ নীতি। সমাজকল্যাণ নীতির প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো ব্যক্তি ও পরিবারের নিকট সরকারি এজেন্সী, স্বেচ্ছাভিত্তিক অলাভজনক সংগঠন অথবা লাভজনক কোম্পানির মাধ্যমে দ্রব্যাদি ও সেবা স্থানান্তর।'

সামাজিক নীতির আংশিক দিক হলো সমাজকল্যাণ নীতি। সমাজকল্যাণ নীতি বলতে সেসব নীতিকে নির্দেশ করে যেগুলো সম্পদ বণ্টনকে প্রভাবিত করে। (Social Welfare policies may be thought of those policies that affect the distribution of resources.)

সামাজিক নীতি এবং সমাজকর্ম

সমাজকল্যাণ নীতি

সমাজকল্যাণ নীতির যৌক্তিক ভিত্তি হলো সীমিত সম্পদ, অপুষ্টি চাহিদা, সামাজিক বৈষম্য এবং ঐক্যের অভাব।

১. সীমিত সম্পদ (Limited resources): সমাজকল্যাণ নীতির প্রথম ভিত্তি (Premise) হলো সম্পদের সীমাবদ্ধতা। সীমিত সম্পদ বন্টনের কৌশল হিসেবে সরকার সমাজকল্যাণ নীতি ব্যবহার করেন।

২. অপূরিত চাহিদা (Unmet needs) : সমাজকল্যাণ নীতির পেছনে বিশেষ একটি যুক্তি হলো, মানুষের অপূরিত অসীম চাহিদা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অপূরিত চাহিদা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। সীমিত সম্পদ এবং ক্রম প্রসারমান অপূরিত চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৌশল হিসেবে সামাজিক নীতি গ্রহণ করা হয়। কীভাবে অসীম চাহিদা এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে ধারাবাহিক সংযোগ সৃষ্টি করা যায়- এটি হলো সামাজিক নীতি নীতির বিবেচ্য প্রশ্ন।

সমাজকল্যাণ নীতি

৩. অসমতা (Unfairness): সামাজিক নীতির তৃতীয় নৈতিক ভিত্তি হলো সামাজিক বৈষম্য এবং অসাম্য। সমাজ নিজেই বৈষম্য সৃষ্টি করে। সামাজিক শ্রেণী ব্যবস্থা, আয় কটনের বৈষম্য এবং লিঙ্গ, বর্ণ, নৃ-তাত্ত্বিক পটভূমি, বয়স, অক্ষমতা, লিঙ্গগত পার্থক্য প্রভৃতির প্রভাবে সমাজে অসাম্য বিদ্যমান থাকে। সমাজে বিরাজমান অসাম্য, সামাজিক নীতির যৌক্তিক ভিত প্রদান করে।

৪. ঐক্যের অভাব (Lack of consensus): সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে ঐক্যমতের অভাব বিদ্যমান। অভিন্ন আদর্শ ও মূল্যবোধের অভাবে সমস্যা মোকাবেলায় ঐক্যমতের অভাব দেখা দেয়। জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সমাজে ঐক্যমত রয়েছে। কিন্তু এসমস্যা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সে ব্যাপারে সর্বজনীন ঐক্যমতের ভিত্তিতে নীতি গ্রহণ করা অত্যন্ত জটিল। জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত, যৌন শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার অভাব সামাজিক নীতির যৌক্তিকতা স্পষ্ট করে তোলে।

সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য

সামাজিক নীতি সমাজের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়নের নীল নকশা। রাষ্ট্রের বা সরকারের ম্যান্ডেট বা জনকল্যাণমূলক ঘোষণা বাস্তবায়নের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচির নির্দেশনা উপস্থাপন করে সামাজিক নীতি উত্তম ও কার্যকরী সামাজিক নীতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। সামাজিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. অনুভূত প্রয়োজনের ভিত্তিতে সামাজিক নীতি প্রণীত হতে হবে। অর্থাৎ নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা জনগণ প্রত্যক্ষ ও সরাসরি উপলব্ধি করতে হবে। সমাজের আগ্রহ বা চাহিদা না থাকলে সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না।

২. বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন অর্থাৎ নীতি বিশারদদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন উত্তম। সামাজিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সামাজিক নীতি প্রণয়ন। উত্তম ও কার্যকর নীতির মূল উপাদান হলো সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য।

৪. সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কার্যকর সামাজিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবশ্যই বাস্তবায়ন উপযোগী। নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের কৌশল নীতির মধ্যে থাকতে হবে।

সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য

৫. সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকা উত্তম নীতির বৈশিষ্ট্য। সময়ের পরিবর্তনে সামাজিক চাহিদা পরিবর্তন হয়। আবার একটি সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের প্রভাবে যে পরিবর্তন হয়, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সময়ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়।

৬. সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

৭. সামাজিক নীতি প্রণয়নের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হলো নীতি অনুধ্যান (Policy study)। নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা যাচাই এবং বাস্তবসম্মত নীতি প্রণয়নের পূর্বশর্ত হলো নীতি অনুধ্যান।

সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য

৮. পর্যাপ্ত বস্তুগত ও মানব সম্পদের ভিত্তিতে সামাজিক নীতি প্রণয়ন। সামাজিক নীতি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। সামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নীতি বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং নীতি বাস্তবায়নের প্রাপ্ত মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের ভিত্তিতে নীতি প্রণীত হতে হবে।

০৯. সামাজিক নীতি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হওয়া প্রয়োজন। যাতে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক নীতির মধ্যে পরিবর্তন করা যায়, কারণ সামাজিক নীতি চূড়ান্ত নয় বরং নমনীয়।

সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য

সামাজিক নীতির মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণের নির্দেশনা প্রদান। সরকারের কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল উপায়ে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি প্রণীত হয়। অধ্যাপক টিটমাস (Prof. Titmuss) সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, জনগণের কল্যাণে সরকার কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রণীত, সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রক্রিয়া হলো সামাজিক নীতি। সুতরাং সমাজের কল্যাণই সামাজিক নীতির প্রতিপাদ্য বিষয়।

সামাজিক নীতি হচ্ছে সমাজের সচেতন প্রচেষ্টা। যার উদ্দেশ্য সন্তোষজনক মানবকল্যাণ এবং সমাজ কাঠামোর মধ্যে মানব সম্পর্কের উন্নয়ন সাধনের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সামাজিক নীতির প্রধান চালিকাশক্তি হলো সমাজের প্রত্যেক সদস্যের ন্যূনতম জীবন মান এবং নির্দিষ্ট কতিপয় সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করা।'

ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যাফিট (Professor Lafitte) মতে, যেসব সুযোগ-সুবিধা মানব জীবনকে আনন্দময় ও সহজ করে তোলে, সেসব ব্যবস্থাসম্পন্ন যৌথ পরিবেশ গঠন সামাজিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি উদাহরণ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশ ও শব্দ দুষণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের সুনির্দিষ্ট নীতির কথা বলেছেন। কারণ, এসব যৌথ সুযোগ-সুবিধা ব্যক্তিগতভাবে বাজার থেকে ক্রয় করা যায় না।

সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য

সামাজিক নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিরাজমান সামাজিক সমস্যার মোকাবেলা করা। Bruce S Jansson-এর মতে, সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হলো ক্ষুধা, দারিদ্র্য, মানসিক অসুস্থ্যতা প্রভৃতি সমস্যা বিমোচন। (Social policies aim to alleviate social problems such as hunger, poverty and mental illness.)" সামাজিক সমস্যা নিরূপণ করে সেগুলো সমাধানের এবং ভবিষ্যতে যাতে এরূপ সমস্যার উদ্ভব না হয়, সেজন্য সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়।

সামাজিক নীতি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠান, আচার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি যেগুলো সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলো পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রণীত হয়। সামাজিক নীতিকে পরিবর্তনের ইতিবাচক হাতিয়ার (Positive instrument of change) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সামাজিক নীতি উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে, তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়।

সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য

সামাজিক নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে দুঃস্থ-অসহায় শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ। সম্পদ পুনর্বণ্টনধর্মী সামাজিক নীতি বস্তুগত-অবস্তুগত সম্পদের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ধনীদের নিকট থেকে দরিদ্রদের, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ের এবং কর্মজীবন থেকে অক্ষম প্রবীনদের মধ্যে সম্পদ পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করে।

বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হতে সামাজিক নীতির লক্ষ্য হলো সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং জনগণের কল্যাণের অবস্থান (Level of welfare) নির্ধারণ করা। সময় ও সম্পদের অপচয় রোধ এবং কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি রোধ করে বাঞ্ছিত উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি. সামাজিক নীতির লক্ষ্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সী হতে নাগরিকরা কি ধরনের সেবা পাবে, তা সুস্পষ্টভাবে সামাজিক নীতি প্রকাশ করে।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পর্যায় হলো নীতি প্রণয়ন (Policy formulation), যার জন্য বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানীয় দক্ষতা প্রয়োজন। অন্যটি হলো নীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Policy implementation planning), যার জন্য প্রধানত সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট বাস্ত ব দক্ষতার প্রয়োজন। নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট কতগুলো ধাপ (Phase) রয়েছে। ধাপগুলো হলো-

১. নীতি প্রণয়নের অনুভূত প্রয়োজন (Perceived necessity of social policy);
২. নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Taking decision);
৩. নীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন (To form a committee);
৪. নীতি বিশ্লেষণ বা নীতি অনুধ্যান (Policy analysis or policy study);
৫. খসড়া নীতি প্রণয়ন (Trial formulation of policy);
৬. চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন (Formulation of final policy)।

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

১. নীতি প্রণয়নের অনুভূত প্রয়োজন (Perceived necessity of social policy): যেসব দ্রব্যাদির প্রয়োজন পূরণ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি বা বাস্তব দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করে সেসব প্রয়োজনই হলো অনুভূত প্রয়োজন। সামাজিক নীতির প্রত্যক্ষ ও সরাসরি প্রয়োজন জনগণ কর্তৃক উপলব্ধি হওয়ার অর্থকে নীতির অনুভূত প্রয়োজন বলা হয়। নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবার মধ্যদিয়ে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। জনগণ যখন কোন সমস্যা মোকাবেলার জন্য সচেতন হয়ে উঠে, তখন তাদের মধ্যে নতুন সামাজিক নীতির আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সমাজের আগ্রহ সৃষ্টি না হলে, নতুন সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয় না। সরকার বা নীতি প্রণেতা অথবা যাদের প্রয়োজন ও কল্যাণে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়, তাদের কাছ থেকেও নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রহ প্রকাশ পেতে পারে।

২. নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Taking decision): নীতির স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনগণের আগ্রহ ও সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ পর্যায়ে নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সরকার বা প্রশাসনের তরফ হতে স্বীকার করে নেয়া হয়।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

৩. নীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন (To form a committee) : নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার এপর্যায়ে নীতি প্রণয়ন কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন। যখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নীতি প্রণয়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন নীতি প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং নীতি প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেন। বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যমে নীতির খসড়া প্রণয়ন করেন। এটি নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা না হলে, নীতি ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক।

৪. নীতি বিশ্লেষণ ও নীতি অনুধ্যান (Policy analysis and policy study): নীতি বিশ্লেষণ হলো সুশৃঙ্খল উপায়ে কোন নির্দিষ্ট নীতি এবং যে প্রক্রিয়ায় উক্ত নীতি প্রণয়ন করা হয় তার মূল্যায়ন নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি তাঁদের নীতি বিশ্লেষণ দক্ষতা দ্বারা বিকল্প নীতি নির্দিষ্টকরণ, সেগুলোর সুবিধা-অসুবিধার তুলনামূলক মূল্যায়ন, উন্নত নীতিমালার প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা গ্রহণ করেন। নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা মূল্যায়ন করে বিশেষজ্ঞ কমিটি পরবর্তী পর্যায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

৬. চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন (Formulation of final policy) : নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায় হলো চূড়ান্ত নীতি উপস্থাপন ও বিধিবদ্ধকরণ। পরীক্ষামূলক নীতির (Trial policy) মূল্যায়নের পর সামাজিক নীতির চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। নীতি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার পর নীতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। চূড়ান্ত নীতিতে, নীতির প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, দর্শন ও মূলনীতি, বাস্তবায়নের কলা-কৌশল, উপায়-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকে।

নীতি বিধিবদ্ধ করার মধ্যদিয়ে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী পর্যায় হলো নীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Policy implementation planning)।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নীতির কার্যকারিতা বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে নীতি অনুধ্যান (Policy study) করা হয়। পরীক্ষামূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তার যথার্থতা অনুধ্যানের (Study) মাধ্যমে নীতির ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। সামাজিক নীতিকে অধিক বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর করার জন্য "Policy study" কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি সামাজিক নীতি প্রণয়নের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া (Scientific process) হিসেবে পরিচিত এবং স্বীকৃত।

৫. খসড়া নীতি প্রণয়ন (Trial formulation of policy) : নীতি প্রণয়নে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি নীতি বিশ্লেষণ ও নীতি অনুধ্যানের ফলাফলের ভিত্তিতে খসড়া নীতি প্রণয়ন করেন। খসড়া নীতির উপর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করা হয়। অনেক সময় কর্মশালার আয়োজন করে খসড়া নীতির সামগ্রিক দিকের প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

টপিক – ০২ বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর নির্দেশনার আলোকে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ প্রণীত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রধান বিধান

১৭. রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাংলাদেশে প্রণীত শিক্ষানীতির মধ্যে অন্যতম। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রতিটি স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং লক্ষ্যার্জনের সুনির্দিষ্ট কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

শিক্ষা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সূলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ ৩০টি নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির
লক্ষ্যগুলোর মধ্যেই সামগ্রিক দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লক্ষ্যগুলো উল্লেখ করা হলো-

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশে মাধ্যমিক স্তরেও একই ভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/ শিক্ষাথীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষনায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষনার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে, সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরন হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসী সহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষা ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকা গুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তনিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা। কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

প্রাথমিক শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রাথমিক শিক্ষার ১০টি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।

শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিস্টাচার, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকারসহ জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সোহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন: প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

ভর্তির বয়স : বর্তমানে চালু ৬+বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।

বয়স্ক শিক্ষা : বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে স্বাক্ষর, লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন এবং পেশাগত দক্ষতায় উন্নত করে তোলা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সকলকে সাক্ষর করে না তোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে যায় এই ব্যবস্থায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে, যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী যোগ্যতাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় উপযুক্ত শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।রাতিষ্ঠ

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

মাধ্যমিক শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-

শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।

কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।

মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা।

নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয় এবং বাস্তবায়ন করা।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই শিক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-

দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

মাদরাসা শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: মাদরাসা শিক্ষায় সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। মাদরাসা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-

শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ করে তোলা।

শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

উচ্চশিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ

কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান। অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদান করা। পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র সমাজের সমস্যা সনাক্ত করা ও সমাধান বের করা। নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রম সম্প্রসারণ। আধুনিক ও দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি। জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী হতে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি। মেধার বিকাশ এবং সৃজনশীল নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন। জ্ঞান সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

প্রকৌশল শিক্ষা

প্রকৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-

সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী, দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগারি জনশক্তি গড়ে তোলা যাতে তারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন। সর্বক্ষেত্রে তথ্যপযুক্তির উপর জোর দেওয়া যাতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক বাংলদেশ গড়ায় প্রকৌশলীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা

চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ-

আপামর জনগণের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুস্থ্য ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্তমানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য জনশক্তি গড়ে তোলা।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা

চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ-

আপামর জনগণের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুস্থ্য ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্তমানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য জনশক্তি গড়ে তোলা।

বিজ্ঞান শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা। শুধুমাত্র যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা জাতিকে দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

বিজ্ঞান শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা। শুধুমাত্র যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা জাতিকে দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-

উপর্যুক্ত কর্মযজ্ঞের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান ও গুণসম্পন্ন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির প্রচেষ্টা চালানো। তথ্য প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বিজ্ঞানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ।

ব্যবসায় শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার ৮টি নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রধান হলো- ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা। কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর সামর্থ্য বৃদ্ধি করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের পথ সুগম করা।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

কৃষিশিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: কৃষি শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রধান হলো-

দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন। পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে জাতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যাপক অভিঘাত মোকাবেলা করে কৃষি উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য জোরদার গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

আইনশিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: আইনশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে-

জনগণের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদক্ষ শিক্ষক, আইনজীবি, আইনবিদ ও বিচারক তৈরিতে সাহায্য করা। এমন উচ্চ যোগ্যতা, উন্নত চিরত্র, ধীশক্তি ও জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করা যাঁরা আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবেন। পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইনশিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবেন।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

নারীশিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতয়ী উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে। সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- নারীকে সচেতন ও প্রত্যয় করা এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা। সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট, গার্লস গাইড এবং ব্রতচারী

ক. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা: বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- শিক্ষার মূল ধারায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ. স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা: এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী করা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শরীরচর্চা ও খেলাধুলাকে একটি আবশ্যিক বিষয় করা।

গ. স্কাউট, গাল গাইড ও বিএনসিসি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: দেশের শিশু কিশোরকিশোরী ও তরুণতরুণীদের যথাক্রমে স্কাউট ও গালগাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কমোদ্যোগী, সেবাপরায়ন, স্বাস্থ্য সচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখা। বিএনসিসির আওতায় অনুশীলনের মাধ্যমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনে কর্মদক্ষতা, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঘটানো।

ঘ. ব্রতচারী

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- ব্রতচারী শিক্ষা যোগ্য নাগরিক হওয়া, শ্রমজীবী মানুষকে সম্মান' করা, অসম্প্রদায়িকতা অনুশীলন করা, পরিশ্রমী হওয়া, দেশ গড়ার কাজে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চলানো এবং মানুষের সেবা করা।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতি

ক্রীড়াশিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ক্রীড়া শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ন স্থান দিয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ক্রীড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। দেশের সকল অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা যেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা। পেশা হিসেবে ক্রীড়াকে গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা। ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা।

গ্রন্থাগার

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: গ্রন্থাগার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- বইপড়ার সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যো পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং সকলের জন্য শিক্ষার সুষম সুযোগ সৃষ্টি করা। পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাগারগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করে আন্তর্জাতিক জ্ঞান সংগ্রহের পথ সৃষ্টি করা। জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ ও গবেষণার প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী করা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

টপিক – ০৩ বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

প্রস্তাবনা

সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার। সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন তথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশের মানুষের এ সকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে আসছে। এ নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সরকার ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির একটি রূপরেখা প্রণয় করেন এবং জনসংখ্যা সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে এ সময় থেকে চিহ্নিত করা হয়। এ নীতি সরকারের সবচেয়ে সফল নীতিসমূহের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়।

সামগ্রিকভাবে একটি ব্যাপকভিত্তিক নীতিমালার মাধ্যমে জনসংখ্যার মতো জটিল জাতীয় সমস্যা মোকাবেলা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্থিতিশীল জনসংখ্যা অর্জনে প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি বিষয়ক, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম প্রভাবিত করতে পারে। আর এ সকল মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও উদ্যোগে একটি সুসমন্বিত জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা ছাড়া জনসংখ্যা সমস্যার মাত্রা ও ভয়াবহতা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪ এর উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals-MDGs) এবং অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (IPRSP) আলোকে জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সমতা বিধানের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নত করা। জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রধান লক্ষ্য হলো-

১. পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মহিলা প্রতি প্রজনন হার (TFR) হ্রাস করা এবং সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

২. ২০১০ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার ১ অর্জন করা, যাতে ২০৬০ সালে স্থিতিশীল জনসংখ্যা (stable population) অর্জিত হয়;

৩. সকলের জন্য পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা এবং এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৪. মাতৃ মৃত্যু হ্রাসকে গুরুত্ব দিয়ে মায়ের স্বাস্থ্য উন্নত করা;

৫. প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং যৌন রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা এবং এইচআইভি/এইডস এর বিস্তার রোধ করা;

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

৬. এক বছরের কম বয়সী এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করা;
৭. মা ও শিশুদের অপুষ্টি হ্রাস করা;
৮. স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমে লিঙ্গ বৈষম্য (Gender discrimination) দূরীকরণ কর্মসূচিকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করা ও উৎসাহিত করা;
৯. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রম নিশ্চিত করা;
১০. নারী-পুরুষের সমতা (Gender equity) এবং নারীর ক্ষমতায়ন (Women empowerment) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়তা করা;
১১. পরিকল্পনাবিদ, ব্যবস্থাপক ও সেবা প্রদানকারীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা ও তথ্য উপস্থাপনা উন্নত করা;
১২. বয়স্ক, সুস্থ এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীসহ অনগ্রসর ব্যক্তিবর্গের জন্য খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা;

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

১৩. গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাস করার লক্ষ্যে কার্যকর সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

১৪. নিরাপদ জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাসহ টেকসই পরিবেশ (Environmental Sustainability) সম্পর্কিত পদক্ষেপসমূহকে সহায়তা করা;

১৫. জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সহনীয় পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলকে সহায়তা করা;

১৬. জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যকার সংযোগ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সময় নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি ও বাস্তাবয়ন কৌশলে জনসংখ্যা বিষয়কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

বাস্তবায়ন কৌশল

জনসংখ্যা নীতির উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে নিচে বর্ণিত বাস্তবায়ন কৌশল গ্রহণ করা হবে বলে নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. সেবামুখী কৌশল

জন্ম, মৃত্যু ও রোগগ্রস্ততার উচ্চহার মোকাবেলায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি ব্যাপকভিত্তিক সেবাগ্রহীতা-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

দক্ষ সেবা প্রদাকনকারীদের সহায়তায় সকল সন্তান প্রসব সম্পাদন নিশ্চিত করা;

কমবয়সী, কমসন্তান রয়েছে এমন দম্পতি, নব বিবাহিত দম্পতি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবার অপূর্ণ চাহিদা রয়েছে এমন দম্পতিদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া।

পরিকল্পিত পরিবার গ্রহণের জন্য এক সন্তানের দম্পতিকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

সকলের জন্য এবং বিশেষ কর অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য যৌনরোগ, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

২. কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সেবা

পরামর্শ সেবাসহ বিভিন্ন তথ্য ও সেবা প্রদান করা, যার উদ্দেশ্য হবে- দেরিতে বিয়ে, যথাসসম্ভব বিলম্বে প্রথম সন্তান নেয়া, দুই সন্তানের মাঝে যথেষ্ট বিরতি দেয়া, এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং যৌনবাহিত রোগ ও এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে তথ্য পাবার উন্নত সুযোগের ব্যবস্থা করা;

কিশোর-কিশোরিদের স্বাস্থ্য ও জীবনমূখী দক্ষতা শিক্ষা প্রদান করা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সেবা প্রদানকারীদের পরামর্শ দেয়া।

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

৩. নারী-পুরুষের সম অংশীদারিত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন

নারী-পুরুষের মধ্যে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিচের কৌশল গ্রহণ।

সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্মসূচি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য গ্রহণীয় (gender sensitive) উপায়ে প্রণয়ন করা;

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও ক্ষুদ্র-ঋণের (micro-credit) ব্যবহারসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং সনাতন ভূমিকা ও পেশা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁদের সক্ষম করে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

নারী ও শিশু পাচারসহ সকল ধরনের নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন বন্ধ করা;

মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরুষদের আরো দায়িত্বশীল করে তোলা;

স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেমেদের মধ্যে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

৪. জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কৌশল

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কৌশলে (Population and development strategies) নিচের চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে-

বয়স্ক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণমূলক সেবা;

নগরমুখীতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ণ;

সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার।

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

জনসংখ্যা ও পরিবেশ : শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শহর ও নগরে যানবাহন চলাচল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পেয়েছে। আবাসন স্বল্পতা, স্বল্প পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ এবং বায়ু দূষণ প্রতিনিয়ত পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলছে। এসব সমস্যা সমাধানে-

গ্রাম ও শহরাঞ্চলে কৃষি জমি নষ্ট করে আবাসন গড়ে তোলা নিরুৎসাহিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

গ্রামে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি (social afforestation program) শক্তিশালী করা এবং শহর ও নগরে দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

সকল নাগরিকের জন্য আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং আর্সেনিকমুক্ত পানির বিকল্প উৎস চিহ্নিত করা;

যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যানবাহন সৃষ্ট দূষণ কমিয়ে আনা;

বস্তি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা।

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নের (Human Resource Development-HRD) লক্ষ্যে নিচের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কৌশল গ্রহণ করা।

দেশের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা এবং বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা; জনসংখ্যা বিজ্ঞান ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

জনসংখ্যা নীতি কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ: জনসংখ্যা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে

জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, উপজেলা থেকে নিম্ন পর্যায়ে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা;

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ: জনসংখ্যা সংক্রান্ত সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি খাত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। নিবন্ধীকৃত বেসরকারি সংস্থাকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবা বঞ্চিত এলাকাসমূহে কাজ করার সুযোগ প্রদান করা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, দ্বৈততা পরিহার এবং সমন্বয় নিশ্চিত করা।

পরিকল্পিত পরিবার গঠন : দেশের সীমিত সম্পদের বিষয়টি বিবেচনা করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে "দু'টি সন্তানের বেশী নয়, একটি হলে ভাল হয়" এ শ্লোগানকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে চিকিৎসকদের ভূমিকা: জনসংখ্যা নীতির আওতায় পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসকগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকগণের অংশগ্রহণ; প্রজনন স্বাস্থ্যের নিশ্চিয়তা বিধানকল্পে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌন রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা এবং এইচআইভি/এইডস এর বিস্তার রোধে সরকারি/ বেসরকারি চিকিৎসকগণের অংশগ্রহণ; সকল সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসালয়ে নিয়মিতভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবাসমূহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।

আইনগত এবং সামাজিক ব্যবস্থা: জাতীয় জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং এ সম্পর্কিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নের জন্য কিছু আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন ও পদ্ধতিসমূহ সংস্কার করা এবং বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

জনসংখ্যা কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা: জনসংখ্যা কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে জনসংখ্যা নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ (National Population Council-NPC), জাতীয় জনসংখ্যা নীতির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

টপিক – ০৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর তিনটি বিভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে নীতির ভূমিকা নারী উন্নয়নের পটভূমি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন. নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদের বাস্তবায়ন তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির দ্বিতীয় ভাগে মূল ধারাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যসহ বিভিন্ন দিক বিষদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে নারী উন্নয়নের মূলধারা এবং বাস্তবায়ন কৌশলগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সরকার দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার-প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তৎকালীন সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রনয়ণ করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

এমতাবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সরকার প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতির পূনর্বহাল এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও সংবিধান

১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না"। ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে " রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভকরিবেন"। ২৮(৩) এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয় কোন নাগরিকের কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। ২৮(৪) এ উল্লেখ আছে যে, " নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না"।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

২৯ (১) এ রয়েছে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে"। ২৯(২), আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রর্দশণ করা হইবে না"। ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫ টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমুহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ

১. বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

২. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩. নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

৪. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৫. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬. নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা।

৭. নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

৮. নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।,

৯. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।

১০. নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

১১. নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।
১২. রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সবর্ত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
১৩. নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
১৪. নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।
১৫. নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
১৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্থ নারীর পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।
১৭. প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

১৮. বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

১৯. গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা সহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলন করা।

২০. মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।

২১. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

২২. নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ: মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা। পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা।

কন্যা শিশুর উন্নয়ন : বাল্যবিবাহ, কন্য শিশুর ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা। কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন- খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ: পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং প্রয়োজ নতুন আইন প্রণয়ন করা। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনা সৃষ্টি করা।

সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা: সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারীর প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসরণ করা।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি: ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ : অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা। সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যাবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া। শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা। নারী-পূরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর বার্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা। নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তভূক্ত করা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারী দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে-
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপি শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা। উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা। ফাক নারীর কর্মসংস্থান : নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্বক উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা। নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত (Disaggregated) ডাটাবেইজ প্রণয়ন : নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কাজের জন্যে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

সহায়ক সেবা: সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন, শিশুর যত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য গৃহায়ণ, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা।

নারী ও প্রযুক্তি : নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

নারীর খাদ্য নিরাপত্তা: দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালি করা। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

নারী ও কৃষি : কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ্যভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমুহকে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। রাজনৈতিক দলের পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশ উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ্য ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন: প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের (Lateral entry) ব্যবস্থা করা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশে সর্বত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি: নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা- শৈশব, কৈশর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা। নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।

গৃহায়ণ ও আশ্রয়: পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা। একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

নারী ও পরিবেশ: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা: দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেনতনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্থ নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম: জাতিসংঘে প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী নারীর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন নারী যেন জাতীয় নারীনীতির আওতায় কোন প্রকার অধিকার, সুবিধা, ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবা সমূহের সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা।

নারী ও গণমাধ্যম: গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বিশেষ দুর্দশাগ্রস্থ নারী: যদি কোন নারী বিশেষ পরিস্থিতির কারণে দুর্দশাগ্রস্থ হন তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

নারী উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো: নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন, মাহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

সংসদীয় কমিটি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

নারী উন্নয়নে ফোকাস পয়েন্ট: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাস পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি-বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের দিয়ে একটি "নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়: নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

তৃণমূল পর্যায় : তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে।

নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা: গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের সকল স্তরের নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী সেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে।

নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান: ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরনসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কৌশল: মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা এবং জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংগঠন সমুহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

আর্থিক ব্যবস্থা : তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

টপিক – ০৫ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

শিশু কল্যাণ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে বাস্তবমুখী শিশু নীতির উপর। এজন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করেন। ১৯৯৪ সালের জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিশুদের সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ২০১১ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণীত হয়।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

জাতীয় শিশু নীতির ভূমিকা

বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তন, উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিত্য নতুন চাহিদা ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশু নীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী ও আধুনিক একটি শিশু নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একটি সুদূরপ্রসারী রূপকল্প।

বাংলাদেশের জাতীয় নীতিতে প্রথম থেকেই শিশু উন্নয়নের চিন্তা স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (৪) ধারা অনুযায়ী শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর দানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দিকে এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৪ সালের শিশু নীতি বাস্তবায়নের আলোকে শিশুদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশে সরকার জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফল হলো ২০১১ সালের জাতীয় শিশু নীতি।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সংজ্ঞা

১. শিশু: শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে।

২. কিশোর কিশোরী: কিশোর কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বুঝাবে।

পরিধি : জাতীয শিশু নীতি বাংলাদেশের নাগরিক সকল শিশুর ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনভাবে প্রযোজ্য হবে।

মূলনীতি

১. বাংলাদেশের সংবিধান, শিশু আইন ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ।

২. শিশু দারিদ্র্য বিমোচন।

৩. শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ।

৪. কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ।

৫. শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ও অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গগত, ধর্মীয়, জাতিগত, পেশাগত, সামাজিক, আঞ্চলিকবও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পরিচয় নির্বিশেষে সকল শিশু ও কিশোর কিশোরীর জন্য. মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সের্বোত্তম উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।

২. কন্যা শিশু এবং প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩. শিক্ষা ও শিশু বৃন্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের দেশ সম্পর্কে আগ্রহী ও সচেতন করে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা সৎ, দেশপ্রেমিক ওদায়িত্বশীল নাগরিক রূপে বিকাশ লাভ করতে পারে।

৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে শিশুদের একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে দেশ ও বিশ্বের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়।

৫. শিশুদের জন্য অনুকূল পারিবারিক পরিবেশে সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ

শিশুর নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ; শিশুর দারিদ্র বিমোচন বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান; সকল শিশুর জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ; শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর) কার্যক্রম শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করণ।

শিশুশিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। অর্থনৈতিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অন্যান্য কারণে পশ্চাৎপদ ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষাপোকরণসহ উৎসাহ প্রদানকারী বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগড়ি শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

শিশুর বিনোদন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: শিশুর জন্য মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শিশুর সুরক্ষা : সকল প্রকার সহিংসতা, ভিক্ষাবৃত্তি, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম: জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকর অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম: অটিস্টিক শিশুদের অধিকাংশই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ও সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিশুর জন্ম নিবন্ধন : সকল শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা হবে। জন্ম নিবন্ধন আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং এর প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা: দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে। দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ: শিশুর অধিকার ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে শিশুর উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমে তাদের মতামত ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন: কিশোর কিশোরীদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিশোর কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা, বিয়ে, পাচার, বাণিজ্যিকভাবে যৌন কাজে বাধ্য করা এবং অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ থেকে রক্ষার মাধ্যমে তাদের সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

কন্যা শিশুদের উন্নয়ন: আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা হবে। কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা হবে।

শিশুশ্রম নিরসনের পদক্ষেপসমূহ: শিশুশ্রম পর্যায়ক্রমে নিরসন করা হবে। শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এর আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশুকে যেন কোন ধরনের অসামাজিক বা অমর্যাদাকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা না হয় তা নিশ্চিত করা হবে। কর্মস্থলে দৈনিক কর্মঘণ্টা ও এর মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে কর্মবিরতি নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ: শিশু অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে আইনের মাধ্যমে 'শিশুদের জন্য ন্যায়পাল' (Ombudsman for Children) নিয়োগ দেয়া হবে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব

সামাজিক নীতি, সামাজিক পরিকল্পনা এবং সমাজসেবা কর্মসূচির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং সমাজ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। নীতি হলো সুপরিকল্পিত সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা।

সামাজিক নীতি সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্য অপরিহার্য। কার্যকর ও বাস্তব সামাজিক নীতির অনুপস্থিতিতে যে নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা সমাজের দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন শ্রেণির কল্যাণের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করে। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় সামাজিক নীতি এমন এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যা কোন এজেন্সী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি বা কর্মকর্তা উপেক্ষা করতে পারে না।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব

সামাজিক নীতি হলো সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার যৌথ কৌশল। সামাজিক নীতির লক্ষ্য সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার মাধ্যমে সন্তোষজনক মানবকল্যাণ এবং সমাজ কাঠামোর মধ্যে মানব সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন। সমাজ এবং সমাজের মানুষের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণই সামাজিক নীতির লক্ষ্য। সামাজিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে সামাজিক নীতি। সামাজিক নীতি হলো সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত সুপ্ত চালিকা শক্তি। সামাজিক নীতি নাগরিকদের কল্যাণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত। মনীষী রিচার্ড এম টিটমাস সামাজিক নীতিকে সুনির্দিষ্টভাবে একটা সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, "Social policy more precise a system of social welfare, Social policy is directed to provide welfare for citizens."

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব

যেসব নীতি জনকল্যাণের পথ নির্দেশক, শুধু সেগুলোকেই সামাজিক নীতি বলা যায়। সামাজিক দিক নিয়ে ব্যাপৃত হলেই তাকে সামাজিক নীতি বলা যাবে না। সামাজিক নীতি হচ্ছে জনগণের উন্নয়নে গৃহীত পথ নির্দেশিকা, যা সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার কার্যাবলিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে। সামাজিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পূর্ব নির্ধারিত যেসব আদর্শ এবং বিশ্বাসকে নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, সেগুলো হলো সামাজিক নীতি। সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ধারণ, প্রণয়ন এবং উন্নয়নের প্রক্রিয়া হলো সামাজিক নীতি। শিশুকল্যাণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের নতুন নীতি হচ্ছে- সরকারি শিশু সদনগুলোকে শিশু পরিবারে পরিণত করে, পারিবারিক পরিবেশে শিশুদের গড়ে উঠতে সাহায্য করা। এ নীতি সরকারি শিশু সদনগুলোর সামগ্রিক কার্যক্রমের দিক নির্দেশনা হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এ নীতির আলোকেই শিশু সদনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণীত হবে।

সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের জন্য সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে, জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই সামাজিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার পারস্পরিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। উভয়ের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সমস্যা, অনাচার এবং অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে, সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সাধন।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব

সামাজিক নীতির কাজ হচ্ছে সামাজিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা। পক্ষান্তরে, সামাজিক পরিকল্পনার কাজ হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজ সেবায় রূপান্তরিক করার সর্মসূচি প্রণয়ন করা। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের বাহন হচ্ছে সামাজিক পরিকল্পনা। সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের উপর সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের বাহন হচ্ছে পরিকল্পনা এবং সামাজিক পরিকল্পনাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে সামাজিক নীতি।

সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজকল্যাণ তথা পেশাদার সমাজকর্মে সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য মনীষী বিএস জনসন (Bruce S. Jansson)-এর মন্তব্য হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে। সামাজিক নীতি সমাজকর্মীদের মানবসেবা সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব সরবরাহ করছে। সামাজিক নীতি সমাজকর্মীদের মানবসেবা প্রদান ব্যবস্থায় এবং সমাজের মধ্যে ক্ষমতাহীন শ্রেণিকে উপস্থাপন ও নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে অনুমান করতে সাহায্য করছে। পরিকল্পিত ও টেকসই সমাজ উন্নয়নের নীল নকশা হলো সামাজিক নীতি। শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি সামাজিক খাতের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা

পরিকল্পিত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে বাস্তবমুখী সামাজিক নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানামুখী সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা বিরাজ করে।

অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নীতি বাস্তাবায়নের প্রধান সমস্যা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এসব দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষতে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ নোবেল বিজয়ী গুনার মিরদাল (Gunnar Myrdal) এসব দেশকে কোমল রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এসব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রভাবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বিরূপ প্রভাব রয়েছে।

সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সম্পদের প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশে বিদেশি উৎস হতে সম্পদ আহরণ করা হয়। উন্নয়নশীল দেশে অন্যান্য উন্নয়ন প্রচেষ্টার মতো সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হলো অস্থিতিশীল বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ এবং বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা। বিদেশি সাহায্যের অপর্যাপ্ততা এবং বিদেশি সাহায্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাঁধার সৃষ্টি করে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অভাব এবং অভ্যন্তরীণ খাত হতে সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টার অভাব সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা

ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, নদীর ভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পদের ব্যবহারকে যেমন ব্যাহত করছে তেমনি সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। এর প্রভাবে অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের মতো সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যাবহুল উন্নয়নশীল দেশে সমস্যাভিত্তিক সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার। যেমন বাংলাদেশে বিরাজমান ব্যাপক দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য দারিদ্র্য বিমোচন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবে বাস্তবসম্মত দারিদ্র্য বিমোচন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার সবধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নীতির লক্ষ্য ও ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়। সুতরাং গবেষণালব্ধ বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সামাজিক নীতি প্রণীত না হলে তা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নীতি অধ্যয়ন, মূল্যায়ন ও নীতি বিশ্লেষণের মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভাব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্ম অনুশীলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক নীতি। সমাজকর্মীরা আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ (Legislative bodies), জন প্রশাসন সংস্থা যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ বিভাগ), স্বেচ্ছাসেবী তহবিল, দাতা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করে সামাজিক নীতির উন্নয়ন, সংশোধন ও পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে। সমাজকর্মীরা প্রধানত পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে এরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সামাজিক নীতির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সামাজিক সমস্যা। সামাজিক নীতির জন্য সমস্যা চিহ্নিতকরণের মধ্যদিয়ে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াগুলো শুরু হয়। সামাজিক নীতি প্রধানত সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রণীত হয়। যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব সমস্যাভিত্তিক সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা সম্পর্কে, সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করতে ও মতামত গঠনে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো মোকাবেলায় যথাযথ সামাজিক নীতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সামাজিক নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও অবস্থা সম্পর্কে সমাজকর্মীরা তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করতে পারে। সামাজিক সমস্যা, সামাজিক অবস্থা এবং বিদ্যমান সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থার (Societal resource systems) যেমন- হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রভৃতির ত্রুটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক গবেষণা ও সামাজিক জরিপের মাধ্যমে নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়া পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমেও নীতি প্রণয়নের বাস্তবতা সমাজকর্মীরা তোলে ধরতে পারেন।

সমাজকর্মী নিজ এজেন্সী এবং আনুষ্ঠানিক সংগঠনগুলোকে, যে বিষয়ে নীতি প্রণীত হবে সে বিষয় সম্পর্কে জনমত ও জনগণের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে উৎসাহিত করতে পারেন। সমাজকর্মী গণমাধ্যম, জনসভা, প্রকাশনা প্রভৃতির মাধ্যমে নীতির স্বপক্ষে জনমত গঠনে সাহায্য করতে পারেন।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মী সামাজিক নীতি পরিবর্তনের কাজ করার জন্য নতুন ব্যবস্থা (New systems) যেমন- স্টাডি কমিটি, টাস্ক ফোর্স অথবা সদস্যভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারে (Membership organizations)। যে সমস্যা বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে নীতি পরিবর্তন করা হবে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করে প্রয়োজনীয়, সুপারিশ প্রদান করতে পারেন। এ ধরনের কমিটি নীতি পরিবর্তনের বৈধতা যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করতে পারে। একজন সমাজকর্মী নাগরিক কমিটি বা সিভিল সোসাইটিকে সমস্যা অনুধ্যানে সাহায্য করে সামাজিক নীতিকে প্রভাবিত করতে পারেন।

সমাজে বিদ্যমান সংগঠনগুলোর মধ্যে জোট (Coalition) গঠন করে যৌথভাবে সামাজিক নীতিকে প্রভাবিত করতে সমাজকর্মী সাহায্য করতে পারেন। মানবাধিকার গোষ্ঠী, নাগরিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জোট গঠনে সমাজকর্মী সাহায্য করতে পারেন। যাতে করে সামাজিক নীতি পরিবর্তনে এবং বাস্তবায়নে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ হয়।

সমাজকর্মী অন্যান্য সংগঠন ও পেশাদার ব্যক্তিদের এবং প্রত্যক্ষভাবে নীতি নির্ধারণকারীদের নীতি পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শণে উৎসাহিত করতে পারেন। স্টাডি গ্রুপের মাধ্যমে সামাজিক নীতি পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি ও দলিল পত্রাদির ভিত্তিতে নীতি প্রণয়নকারীদের এবং আইন প্রণেতাদের প্রভাবিত করার জন্য অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের কৌশলগত পরামর্শ দিতে পারেন।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

নীতি প্রণয়নের খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুতে সমাজকর্মী সাহায্য করতে পারেন। পরিবর্তিত বা নতুনভাবে প্রণীত নীতির আওতায় কি ধরনের সেবা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, তার খসড়া প্রস্তাব তৈরি করতে সমাজকর্মী সাহায্য করতে পারেন। বিশেষ কোন এলাকা বা বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কি ধরনের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন, তার খসড়া তৈরি করে নতুন নীতির যৌক্তিকতা সমাজকর্মী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন।

সামাজিক নীতিকে সামাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক হাতিয়ার (Positive instrument of social change) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামাজিক নীতি দ্বারা যে পরিবর্তন আসবে, তার ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে সমাজকর্মীরা নীতি নির্ধারকদের সচেতন করতে পারেন। পল্লী উন্নয়নের জন্য কৃষি আধুনিকীকরণের নীতির উল্লেখ করা যায়। কৃষি আধুনিকীকরণ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে, যাদের বৃহৎ কৃষি জোত রয়েছে।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

ভূমিহীন কৃষি মজুর ও বর্গাচাষীদের কোন উপকার হবে না। তাদের জন্য কার্যকর ও বাস্তবসম্মত ভূমি কটন নীতির প্রয়োজন। সমাজকর্মীগণ পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞানের আলোকে সামাজিক নীতি যাতে সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণে প্রণীত হয়, সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

সমাজকর্মীরা সামাজিক নীতির বাস্তব উপযোগিতা ও কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য নীতি অনুধ্যান (Policy study) কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। নীতি বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক কৌশল হলো নীতি অনুধ্যান। নীতি পরিবর্তন, সংশোধন বা নতুন নীতি প্রণয়নের উপযোগিতা যাচাই করতে সমাজকর্মীরা আলোচ্য গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

টপিক – ০৬ সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম

পরিকল্পনা কি?

অদৃষ্টবাদিতার (Fatalism) বিপরীত দর্শন হলো পরিকল্পনা। কীভাবে নির্দিষ্ট ব্যয়ে, নির্দিষ্ট সময়ে সর্বোত্তম উপকার লাভ করা যায়, তার সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হচ্ছে কাজ করার পূর্বে চিন্তা এবং অনুমান অপেক্ষা তথ্যের আলোকে কাজ করার একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। কোন লক্ষ্যার্জনের সুশৃঙ্খল এবং সুব্যবস্থিত প্রস্তুতি হলো পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা কি?

এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা (Encyclopaedia of Britanica) গ্রন্থে ইংরেজি Planning শব্দটিতে ব্যবহৃত সবগুলো বর্ণের সুন্দর বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ব্যাখ্যাটি দেয়া হলো-

P-Process of work. (কাজ করার প্রক্রিয়া);

L - Limited of time, money and manpower. (সীমিত সময়, অর্থ এবং মানব সম্পদ);

A - Analysis of work and result. (কর্ম এবং কর্মফল বিশ্লেষণ);

N - Network of management. (ব্যবস্থাপনার কর্মজাল বা কর্মবেষ্টনী);

N - Normally accepted. (সাধারণভাবে গৃহীত);

I - Implimentable. (বাস্তবায়নযোগ্য);

N - National focus. (জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি গুরুত্বারোপ);

G - Govern by the executive body or council. (নির্বাহী কর্তৃপক্ষ বা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত।)

সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম

পরিকল্পনা কি?

সমাজকর্ম অভিধানের (Social Work Dictionary) সংজ্ঞানুযায়ী "পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, সেগুলো অর্জনের বিভিন্ন উপায় মূল্যায়ন এবং যথাযথ ও উপযুক্ত কার্যক্রম নির্বাচনের প্রক্রিয়া।"

পরিকল্পনার সার্বিক কার্যক্রম তিনটি প্রধান প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তিনটি প্রধান প্রশ্ন হলো- আমরা উন্নয়নের কোথায় আছি; কোথায় যেতে চাই এবং কীভাবে যেতে চাই? এ তিনটি প্রশ্নই হলো পরিকল্পনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

পরিকল্পনার হলো, "অসংখ্য এবং বহুমুখী অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিহ্নিত করে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য একদিকে সম্পদ আহরণ এবং অন্যদিকে সম্পদের খাতওয়ারী বণ্টনের প্রক্রিয়া হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লক্ষ্যার্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিকল্পসমূহ যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

Development Planning

উন্নয়ন পরিকল্পনার দু'টি বিশেষ দিক হলো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সামাজিক পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার সমন্বিত রূপ হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয়।

সামাজিক পরিকল্পনা
Social Planning

উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক পরিকল্পনা। পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ কৌশল (approach) হিসেবে সামাজিক পরিকল্পনা স্বীকৃত। সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "সামাজিক পরিকল্পনা হলো পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থসামাজিক কাঠামো গঠন এবং যৌক্তিক সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাকরণের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।" (Social planning is systematic procedures to achieve predetermined types of socio-economic structures and to manage social change rationally.)

সমাজবিজ্ঞানী সামনার এবং কেলার (Sumner and Keller)-এর মতে, "সামাজিক পরিকল্পনা হলো মানুষের স্বাভাবিক বা সহজাত প্রবণতার বাইরে দূরদৃষ্টির উন্নয়ন, যা মানুষকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করে।" আলোচ্য সংজ্ঞানুযায়ী সামাজিক পরিকল্পনা হলো মানুষের সহজাত প্রবণতার বাইরে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক দূরদর্শিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা। এরূপ দূরদৃষ্টি বা অন্তদৃষ্টি অর্জন ব্যতীত মানুষ সামাজিক বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, চিত্তবিনোদন, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুস্থ্য পরিবেশ প্রভৃতির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের সহজাত প্রবণতার বাইরে সামাজিক প্রবণতার উন্নয়নই সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য।

সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিকল্পনার বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে সাধারণভাবে বলা যায়, "অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে গৃহীত সুচিন্তিত, সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক কর্ম পদ্ধতিকে সামাজিক পরিকল্পনা বলা হয়।" সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সামাজিক পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ না করে, বাঞ্ছিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনয়ন। সামাজিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হলো-

নীতিমূলক দিক : সম্পদের ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের জন্য নীতি ও বিধি গঠন করা এ দিকের আওতাভূক্ত।

কার্যক্রম দিক: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজসেবা প্রভৃতি সামাজিক খাতে কর্মসূচি প্রণয়ন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিকে কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করা এ দিকের অন্তর্ভূক্ত।

মনস্তাত্ত্বিক দিক: পরিবর্তিত অবস্থার সাথে জনগণকে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করা। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধনে জনগণকে সচেতন করে তোলা এ দিকের লক্ষ্য।

সামাজিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

সামাজিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং বহুমুখী। সামাজিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো সামাজিক পরিবেশকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে সামাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক ধারা শক্তিশালী হয়। সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ প্রভৃতি সামাজিকখাতের উন্নয়নে ব্যবহারে সুযোগ বৃদ্ধি। পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির স্বার্থে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানই সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাজ কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যেও সামাজিক পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারে। যেমন- বিবাহ, তালাক, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি দিকের পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে হতে পারে। সামাজিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বস্তুগত বিষয়কে কেন্দ্র করে সামাজিক পরিকল্পনা হতে পারে। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিপ্রেক্ষিতে গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুস্থ্য পরিবেশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করার উদ্দেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। সামাজিক এবং পরিবেশ যেমন দারিদ্র্য, পরিবার কল্যাণ, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি দিকগুলো নিয়ে সামাজিক পরিকল্পনা গড়ে উঠে।

সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির সাথে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানই সামাজিক পরিকল্পনার মূললক্ষ্য। রাষ্ট্র, সরকার, অর্থনৈতিক সংগঠন, ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান সদা পরিবর্তনশীল বিধায়, সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্যও পরিবর্তনশীল।

সামাজিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাপক, গতিশীল এবং বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সামাজিক সমস্যা সমাধান ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করাই সামাজিক পরিকল্পনার মূললক্ষ্য।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিজ্ঞ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। এরূপ পরিকল্পনা সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করবে। পরিকল্পনা নকশা প্রণয়ন, সম্পদ নিরুপণের জন্য অনুসন্ধান পরিচালনা, তথ্য সংগ্রহ, পরামর্শ দান, সমন্বয় সাধন প্রভৃতি কার্যাবলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা সম্পাদন করবে। উত্তম ও কার্যকর পরিকল্পনা অবশ্যই পরিকল্পনায় অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রণীত হতে হবে।

পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন। সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্যাদি। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণীত না হলে, পরিকল্পনার লক্ষ্যার্জন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

উত্তম ও কার্যকর পরিকল্পনার বাস্তবায়নযোগ্য সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূর্বেই চিন্তাভাবনা করে নির্ধারণ করতে হয়। উদ্দেশ্য অবশ্যই বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়ন উপযোগী হতে হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশা এবং প্রাপ্ত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়।

পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজিয়ে নিতে হবে। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হয়। উত্তম ও কার্যকর পরিকল্পনার মধ্যে উৎপাদন ও উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সম্পদের সংস্থান। প্রাপ্ত আর্থিক ও মানবিক সম্পদের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক তথ্যাদি বিবেচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যাতে সম্পদের অভাবে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা মাঝপথে থেমে না যায়।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল থাকতে হয়। সঠিক উন্নয়ন নীতি ও উন্নয়ন কৌশল ছাড়া অর্থবহ পরিকল্পনা প্রণীত হতে পারে না। উন্নয়ন নীতি এবং উন্নয়ন কৌশলের সঠিকতা ও বাস্তবতা কার্যকর পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ।

4 পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হয়। জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলে, পরিকল্পনায় জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা প্রণীত হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে Professor WA Lewis তাঁর Principles of Economic Planning গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "জনগণের অংশগ্রহণ হলো পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জ্বালানি বিশেষ; যা গতিশীল শক্তি হিসেবে কাজ করে।" পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন প্রতিটি পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। এছাড়া পরিকল্পনার জন্য সংগৃহীত অত্যাবশ্যকীয় উপাত্তসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা যাচাই করার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে।

সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যম হলো প্রশাসন। দক্ষ ও দুর্নীতি মুক্ত উন্নয়নমূখী প্রশাসন উত্তম পরিকল্পনার অপরিহার্য শর্ত। তাত্ত্বিক দিক হতে পরিকল্পনা উত্তম ও কার্যকর হলেও, দক্ষ প্রশাসনের অভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে দক্ষ ও শক্তিশালী দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনের অভাব রয়েছে। সুশাসনের অভাবে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। সময় ও সম্পদের অপচয় ঘটে এবং উন্নয়ন অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

কার্যকর ও উত্তম পরিকল্পনার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। উন্নয়ন সমস্যা মোকাবেলা এবং আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।

সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা

পরিকল্পনা নমনীয় ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হতে হবে। দেশের জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে পরিবর্তন করা যায়, সেজন্য উত্তম পরিকল্পনা নমনীয় ও পরিবর্তনক্ষম হতে হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাবিত বিভিন্ন খাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্য নির্ধারণ। কারণ বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে পরিকল্পনা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে না। যেমন সঞ্চয় এবং পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ভারসাম্য নীতির সঠিক প্রয়োগ পরিকল্পনাকে সঠিক রূপ দান করে।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ: পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময় নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা হয়ে থাকে। অনেক সময় সাত বছর মেয়াদি পরিকল্পনাও প্রণীত হয়। বাংলাদেশে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা সাধারণত বার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এ তিন ধরনের হয়।

সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা

সামাজিক পরিকল্পনা বিশ্বের সকল দেশেই গৃহীত হয়। তবে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে কতগুলো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেসব উপাদানগুলো সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সেগুলো এখানে আলোচনা করা হলো।

আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতিকর জটিলতা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ আধুনিক সমাজকে ক্রমান্বয়ে জটিল করে তোলেছে। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতি যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তন আসলে তার প্রভাব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর পরিলক্ষিত হয়। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া প্রসারিত হচ্ছে। ফলে মানুষের মধ্যে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মানুষকে আরামদায়ক জীবনের প্রতি আকর্ষণ করছে। এসব মানবগোষ্ঠী সামাজিক পরিকল্পনাকে উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে, উপভোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছে। আধুনিক জটিল সমাজে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হতে সামাজিক পরিকল্পনাকে মূল্যায়ন করে। সামাজিক বা সমষ্টিগত উন্নয়নের দিক হতে পরিকল্পনাকে বিবেচনা করে না। সুতরাং আধুনিক জটিল সমাজে সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একক বা বিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়।

সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা

সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদানের দ্রুত পরিবর্তন: আধুনিক সমাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল। সমাজ বা সাংস্কৃতিক উপাদানের যে কোন একটির পরিবর্তন, ক্রমাগত পরিবর্তন (A series of change) বয়ে আনতে পারে। সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের যে কোন একদিকের পরিবর্তন অন্যান্য দিকের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে। দ্রুত সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধারণ' সমাজের স্থিতিশীলতা ও সংহতিকে প্রভাবিত করে। অস্থিতিশীল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থায় সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কঠিন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি: সামাজিক পরিকল্পনা সীমিত জনসংখ্যা অধ্যুষিত সমষ্টিতে সহজে বাস্তবায়ন করা যায়। বৃহৎ জনসংখ্যা অধ্যুষিত সমষ্টিতে সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ নয়। এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক দেশে জনসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনধারণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে সামাজিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা ত্রুটিপূর্ণ গঠন কাঠামো।

সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অভাব: সামাজিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের অন্যতম উৎস হলো অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়। বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হওয়ায় সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে বর্তমান চাহিদা পূরণের জন্য অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে হয়; যা উন্নয়নখাতের বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে।

বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা: অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদেশি সাহায্যের প্রভাব রয়েছে। বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা অনেক সময় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সুনামী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। আয়বণ্টন, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, সাক্ষরতা ও শিক্ষা, নারী পুরুষের ব্যবধান, কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, যুব ও নারী উন্নয়ন ইত্যাদি সামাজিক খাতগুলোর উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনায় খাতভিত্তিক উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশে গৃহীত পরিকল্পনার ধরনগুলো আলোচনা করা হলো।

বার্ষিক পরিকল্পনা: যখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নেয়া হয়, তখন তার মধ্যে বার্ষিক পরিকল্পনা থাকতে হবে। আর বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য আর্থিক বরাদ্ধ, প্রবৃদ্ধির হার প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে অর্জনের কৌশল হলো বার্ষিক পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য আনুপাতিক হারে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিকল্পনার গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাতওয়ারী উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যভিত্তিক নির্দেশনার আলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনার সুবিধার্থে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে সরকারের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে পরিকল্পনা প্রণয়নকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলা হয়। পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনায় খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এরূপ পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে ১৯৭৩-৭৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ২০১১-২০১৫ মেয়াদে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়

বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা

দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা: বিশবছর মেয়াদী পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective planning) বলা হয়। এরূপ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা (Guide line) হিসেবে কাজ করে। দীর্ঘমেয়াদি বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সাধারণভাবে কতগুলো খাত নির্দিষ্ট করা থাকে। এতে খসড়াভাবে কতিপয় খাত উল্লেখ করা হয়। কারণ দীর্ঘ মেয়াদে সঠিকভাবে কোন কিছু সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায় না। অদূর ভবিষ্যতে আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্নখাতে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দীর্ঘমেয়াদী পটভূমিতে যে পরিকল্পনা রচিত হয় তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা সাধারণত বিশ বছর মেয়াদী হয়। এজন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়। মূলত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় কতগুলো খাতে লক্ষ্য (Target) নির্দিষ্ট থাকে মাত্র। দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক সেটিকে কয়েকটি মাঝারি মেয়াদি পরিকল্পনায় ভাগ করা হলে, সে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য (Target) বিভিন্ন খাতে বিভক্ত করা হয়। গুরুত্বানুসারে খাতওয়ারী বার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশে ১৯৯০-২০১০ মেয়াদের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বিশ বছর মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় উন্নয়ন কৌশল হিসেবে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ইউনিয়নভিত্তিক অংশীদারি পরিকল্পনা (Participatory Planning) প্রণয়ন এবং অংশীদারি পরিকল্পনাকে জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় সাধন নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা নমনীয় প্রকৃতির হয়।

মেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্যার্জন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিকল্পনার গুরুত্ব রয়েছে। বার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল মূল্যায়নের পর প্রয়োজনবোধে মেয়াদি পরিকল্পনা সংশোধন করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে Guide line হিসেবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে। পরিকল্পনার মেয়াদ কি হবে এটা পরিবর্তনশীল। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প মেয়াদি, মধ্যম মেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি প্রভৃতি মেয়াদের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা

দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Continuous long-range process)। যার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার ধারাবাহিক প্রয়োগ (Requiring persistent application)। প্রত্যেক পরিকল্পনারই মেয়াদ শেষে কিছু কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়। সেসব কাজ পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উত্তরাধিকার সূত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বের পরিকল্পনা যেখানে শেষ হয়, পরবর্তী পরিকল্পনা সেখান থেকে শুরু করা হয়।

সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সামাজিক নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। পেশাগত দক্ষতা ও নৈপুণ্যসম্পন্ন সমাজকর্মীগণ পরিকল্পনাবিদ হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন কৌশল (Development strategy) নির্ণয়, লক্ষ্যদল (Target group) চিহ্নিতকরণ এবং দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দরিদ্র ও দুঃস্থ শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করার যথাযথ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করে পেশাদার সমাজকর্মীগণ উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে পরিকল্পনাবিদদের সচেতন করে উন্নয়নকে কল্যাণকামী রূপ দিতে সাহায্য করতে পারেন। পরিকল্পনা প্রণয়নবিদ, বাস্তবায়নবিদ এবং পরিকল্পনার লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ বাস্তবায়ন পেশাদার সমাজকর্মীগণ সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্য রোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। পরিকল্পিত সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে-

ক. সামাজিক পরিকল্পনা　　খ. সামাজিক আইন

গ. সামাজিক নীতি　　ঘ. সামাজিক সচেতনতা

২। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কটি?

ক. ৩০টি　　খ. ২৮টি　　গ. ২০টি　　ঘ. ৩২টি

৩। আট বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা কত সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে?

ক. ২০২১　　খ. ২০১৮　　গ. ২০২২　　ঘ. ২০২০

৪। বাংলাদেশে সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রধান সমস্যা হলো-

ক. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অভাব　　খ. বিদেশি বিনিয়োগ কম

গ. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা　　ঘ. দক্ষ নীতিবিদের অভাব

৫। কোমল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো-

i) দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো　　ii) দুর্নীতি

iii) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ii এবং iii　　(খ) i এবং iii　　(গ) i, ii এবং iii　　ঘ) i এবং ii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম এক অমানবিক সমস্যা। শিশুর দৈহিক, মানবিক ও সামাজিক বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষকরে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যে বয়সে শিশুদের স্কুলে যাবার কথা, সে বয়সে তারা পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

৬. জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে শিশু বলতে বুঝায়-

ক. ১৪ বছরের নিচের
খ. ১৮ বছরের নিচের
গ. ১৬ বছরের নিচের
ঘ. ১৪-১৮ বছরের মধ্যে

৭. বাংলাদেশে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়-

i) ১৯৯০-২০১০
ii) ২০০১-২০২১
iii) ১৯৯৫-২০১৫

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) I
(খ) ii
(গ) i এবং ii
(ঘ) iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রোকেয়া দিবস উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক পোস্টার প্রদর্শনীতে বদরুন্নেসা কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী রুবাইয়া ঘুরে ঘুরে পোস্টার দেখছিল। একটি পোস্টারের ক্যাপশন ছিল- "আমরা স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির অর্ধেক অংশ।" রুবাইয়া মনে করে যে সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও মানবজাতির অর্ধেক অংশ নারীর উন্নয়নমূলক কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

ক. সামাজিক নীতি কাকে বলে?

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পোস্টারের ক্যাপশন "আমরা স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির অর্ধেক অংশ।" কথাটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কোন সামাজিক নীতির দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রুবাইয়ার ধারণার যথাযর্থতা বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU